যত্নই যাঁর স্বভাব

অমিয় দেব

তুলনামূলক সাহিত্য এখন এদেশে প্রতিষ্ঠিত। যখন শুরু হয় তখন নানা প্রশ্ন উঠেছিল। এমনকী যে-বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্মলগ্নে একে আবাহন করেছিলেন সেখানেও কারোর কারোর কিঞ্চিৎ দ্বিধা হচ্ছিল : যথেষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে যাচ্ছে তো এর পাঠবিধি, নাকি কবির হাতে পড়ে বিদ্যাচর্চা হবে খেয়ালখুশির অঙ্গনমাত্র? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের তখন কৈশোর, যেমন ভবিষ্যকল্প আছে তেমনি আছে পিছুটানও — তবু তার প্রেরিত বিদ্বদ্বর্গ এসে একে সম্মতি জানিয়ে গেলেন। কেবল একটাই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসুর অবর্তমানে এর কী ভবিষ্যৎ হবে। এটা বোধহয় ১৯৫৭-র কথা : মাত্র কয়েকজনই তখন আমরা ছাত্র — বুদ্ধদেব বসুর অবর্তমানতার কথা ভাবছি না। কিন্তু কয়েক বছর পরেই তা ঘটল — বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাজ থেকে ইস্তফা দিলেন— তখন তুলনামূলক সাহিত্যের যিনি হাল ধরলেন তিনি নরেশ গুহ। গোড়া থেকেই বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে ছিলেন, বছরখানেক হল মার্কিনদেশের নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. করে এসেছেন— বিষয় ইয়েটস ও ভারত, অবধায়ক রিচার্ড এলম্যান। সেটা ১৯৬৩ সাল, খুব সুখের সময় ছিল না, এদিক ওদিক হাওয়া যাচ্ছিল, মাঝে মাঝেই ভয় হচ্ছিল বুঝি এই তরী ডুবল। বুদ্ধদেব বসুকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা তার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘটিয়ে তোলা গেল না। তাঁকেই সামলাতে হল, অবশ্য সঙ্গে পেয়েছিলেন ডেভিড ম্যাকাচ্চনকে যিনি টেরাকোটায় নিমগ্ন হবার আগে তাঁর কেম্ব্রিজের 'আধুনিক মহৎ' পাঠের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিচ্ছিলেন। ১৯৬৫-তে ইয়েটসের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হল আর সেই উপলক্ষে তিনি গড়ে তুললেন ঈষৎ সর্বভারতীয় সংযোগ— তুলনামূলক সাহিত্যের সুহৃদ পেলেন কন্টক - নরসিমহাইয়ার মতো ইংরেজির গুণী ও স্বনামধন্য অধ্যাপকদের। সেই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু প্রবর্তিত 'যাদবপুর জর্নাল অব কম্পারেটিভ লিটারেচার' -কে কেবল বাঁচিয়েই রাখলেন না, তাকে ছড়িয়েও দিলেন — ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠল তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার এক অপরিহার্য অঙ্গ যাতে একবার এক বোদলেয়ার বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ দেখে সর্বন-ভূষণ এতিয়াব্লঁ বলেছিলেন, বাংলা না পড়তে পারলে তাহলে কী করে চলবে কোনো সার্থকনামা তুলনাবিদের। আজ পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে এই বিদ্যার বয়স এদেশে। এর আখ্যান যাঁরা লিখবেন তাঁদের এক পুরো অধ্যায় লিখতে হবে নরেশ গুহকে নিয়ে। সত্যিই একসময় তিনি এই বিদ্যার প্রাণপুরুষ ছিলেন এখানে।

অথচ নরেশ গুহর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। আমি যদি তাঁর ছাত্র না হতাম, আর পরে তাঁর সহকর্মী, যদি হতাম কোনো অন্য পেশার লোক, হয়তো বা মফস্বলি কবিতাপাঠক, তাহলে কি জানতাম ওই নিভৃত গুঞ্জনময় কবিতাগুচ্ছের লেখক তাঁর কর্মজীবনের মুখ্য অংশ কাটিয়েছেন তুলনামূলক সাহিত্য নামক এক নতুন বিদ্যার সেবা করে। এমনকী 'দুরন্ত দুপুর' -এ মুগ্ধ, তাঁর অনেকদিন পরে বেরোনো 'তাতারসমুদ্র-ঘেরা' কিনে ভয়ে ভয়ে তাঁকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার জন্য ছিয়াত্তরের এক রবিবারের বিকেলে যদি ৫ সত্যেন দত্ত রোডের দোতলায় গিয়ে দেখতাম এক খর্বকায় অতরুণের সঙ্গে সব বিদেশী চেয়ারে আসীন ভিন রাজ্যের মানুষ যিনি দৃশ্যতই দ্বিতীয়ের সঙ্গী হয়ে এসেছেন, তিনি কি আদৌ জানেন যে যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তিনি কবি!

হতে পারত তাঁর আপ্ত কর্ম তিনি করেছেন কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, কোনো হৃদয়সংবাদ তাতে নেই কিন্তু না হলে তার কারণ কি ওই কাজের প্রকৃতিতে, নাকি তাঁর স্বভাবে? তাঁর স্বভাব যত্নবান। তিনি যা-ই করেন তা সযত্ন, সে ঝুলবারান্দায় সীমিত পরিমাপের অর্কিড - চর্চাই হোক, বা বইগুছোনো কি চিঠি লেখা, এমনকী ব্যবহারশেষে সাবানদানিতে সাবান প্রত্যর্পণ (কোনো কোনো বাড়িতে হাতধোয়া সাবানের উপর যে - বলাৎকার হয় তা ছিল তাঁর চক্ষুশূল)। সেই যত্নই তাঁর হস্তলিপিতে প্রতিফলিত, প্রতিলিপি রচনায় বা প্রুফপাঠেও তা-ই। অমিয় চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতাসংগ্রহ তিনি সম্পাদনা করেছেন, সম্পাদনা করেছেন তাঁরই একদাগ্রথিক 'টুকরো কথা'-র সংকলন, তাদের প্রমাণ্যতা অর্জনে যে-যত্ন তাঁর ব্যয় হয়েছে তা খুব কম নয়। নানা সময়ে তিনি অনেকের কাছ থেকে অনেক চিঠি পেয়েছেন, যে-যত্নে সেই পত্রাবলি তিনি রক্ষা করে এসেছেন তা ঈর্ষনীয়। আমার এক অর্বাচীন রচনার পাণ্ডুলিপি তিনি পড়ে দিয়েছিলেন : সব রকমের অতথ্য বা কুযুক্তি বা গুরুচণ্ডাল এক আলাদা কাগজে তিনি সংখ্যানুক্রমে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন, ভ্রমের মান অনুযায়ী তাতে তাঁর ব্যবহৃত কালিরও তারতম্য ছিল। তাঁর কাছে সুরক্ষিত টেপ-এ আমি ইয়েটস ও এজ্‌রা পাউন্ডের কণ্ঠ শুনেছি, দেখেছি অনেক ফোটোগ্রাফ। আর ছবি তুলতে যে তিনি ভালোবাসতেন তার সাক্ষী তো আমি — সে কবে একবার ডেভিড ম্যাকাচ্চন, ডেভিড ম্যত্রাকাচ্চনের চিত্রকর বন্ধু ডেরেক (বশিয়ের বোধহয়) ও তাঁর সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম কোণার্ক - ভ্রমণে; রাত্তিরে তাঁর রীতিমত জ্বর, কিন্তু

ভোরে উঠে যখন মন্দির - আরোহণে তাঁকে ডাকলুম তিনি দিব্যি উঠে পড়লেন, হাতে ক্যামেরা - উঁচু অলিন্দে উঠে সুরসুন্দরীদের ছবি তুলবেন।

জানি না এই যত্ন তাঁর বংশাণুসঞ্জাত কিনা, তবে তাঁর কাছে শুনেছি তাঁর যৌবনের সকল অবৈভবের সঙ্গে সংগ্রামের অস্ত্র ছিল তাঁর এই যত্ন— তা বসবাসের পরিসরে বা পরিধেয়ের অতিস্বল্পতায় বা অর্থের অসচ্ছলতা যাতেই হোক না কেন। এও জানি যে যামিনী রায়কে তিনি কিছুদিন খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, আর যত্নসাধনের কোনো আদর্শ যদি আমি একবারও দেখে থাকি তা ছিলেন ওই ডিহি শ্রীরামপুর রোডের শিল্পীশিরোমণি। আজ যখন চারদিকে বহ্বারম্ভ ও অযত্ন তখন নরেশ গুহকে মনে হয় এক বিরল প্রজাতির মনুষ্য। কিন্তু যত্নের দ্বারা কোনো ঐহিক বা পারত্রিক পুণ্যের দ্বার তিনি খোঁজেননি, স্বভাবের অনুবর্তন করেছেন। আজও যখন কোনো ছাপা লেখা পড়ে কোথাও ভুল দেখেন, দুঃখ হয়, ভাবেন আরেকটু যত্ন নেওয়া যেত না? এমন আশাও করেন তাঁর স্নেহভাজন সুহৃদদের অন্তত দু-একজন তাঁদের স্বকর্মে কিঞ্চিৎ যত্নবান হবেন। যদি কেউ বলে, কী হবে অত নির্ভুল হয়ে, জগৎটাই তো ভুলে বোঝাই, হয়তো তর্ক করবেন না, মনে মনে 'ছিন্নপত্র' আওড়াবেন। আর ওই সুহৃদপ্রবর প্রস্থান করলেই ভুল শোধরাতে বসবেন। স্বভাব!

সেই একটা সময় ছিল যখন কারোর বাড়িতে যেতে টেলিফোন করতে হত না। কোনোদিন হয়তো পাঁচ নম্বর সত্যেন দত্ত রোডে গিয়ে দেখলাম অতীতের চেয়ারে বসে আছেন অমিয় চক্রবর্তী, সদ্য নর্থ্যাম্প্টন বা ন্যুপল্জ থেকে এসেছেন। আশ্চর্য এক প্রশান্তির বৃত্ত রচনা করে মৃদুস্বরে কথা বলে যাচ্ছেন - অসামান্য তাঁর আলাপচারিতা। একদিন হয়তো এডওঅর্ড ডিমক, দেখলে বোঝবার উপায় নেই ভারতচন্দ্র বা বৈষ্ণব পদাবলী বা চৈতন্যচরিতামৃত অনুবাদে জীবন কাটাতে প্রস্তুত। হঠাৎ কখনো কখনো লন্ডননিবাসী নিমাই চট্টোপাধ্যায় — এখনকার মতো যখন ঘন ঘন আসতেন না তখন - রসের ফুলঝুরি জ্বলত। আর ১৯৭২ -এ তাঁর অকালমৃত্যুর আগে মাঝে মাঝেই ডেভিড ম্যাকাচ্চন, কাজে নয়, গল্প করবার জন্য। একবার দুবার বন্ধু অম্লান দত্ত বা অরুণকুমার সরকার। প্রায়শই ত্রিদিব ঘোষ যাঁর মতো নিরভিমান পড়ুয়া মানুষ তখন কলকাতায় খুব বেশি ছিলেন না। আর, একবার সাক্ষাৎ হয়ে গেল ট্র্যাপিস্ট মঠবাসী মার্কিন সন্ন্যাসী স্বনামধন্য টমাস মার্টনের সঙ্গে — অমিয় চক্রবর্তী মারফত সেই যোগাযোগ — ব্যাঙ্ককের পথে কলকাতায়, মনে আছে চমৎকার লেগেছিল তাঁকে — জানতেন ব্যাঙ্ককেই তাঁর জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে?

প্রত্যেক বৈঠকখানাই বোধহয় একটু স্বতন্ত্র। কোথাও হার্দ্য তাপ বেশি, কোথাও কম। কোনো কোনোটি হইহল্লার অনুকূল, কোনো কোনোটি একান্ত আলাপের। কোথাও স্বর চড়ে, কোথাও চড়ে না। ইত্যাদি ইত্যাদি যত গোধূলি না হোক ছুটির সকাল বা কাজের দিনের সন্ধের ভজন। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা এভারেস্টজিৎ তেনজিংও বলতে পারত না। পাঁচ নম্বর সত্যেন দত্ত রোডের প্রবণতা ছিল দ্বিতীয়ে। তার হাওয়া ছিল শীলিত। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল তাঁর সৌজন্য যা তখনো সর্বত্র সুলভ ছিল না। আমি অতীত বলছি আমারই সীমার কথা মনে রেখে। নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি এখন যে কাজ ছাড়া আর কারোর কাছে যাওয়া প্রায় ঘটেই ওঠে না। তবে এখনো যখন যাই — না হয় কাজেই - সেই স্বাদ পাই। বয়স বেড়েছে পাঁচ নম্বরের, কিন্তু ধুলো জমেনি।

তাঁর ভূষণ একদা ছিল 'বৌদ্ধ' এবং যদিও তিনি বুদ্ধদেব বসুর অতি আপন ছিলেন, তাঁর প্রতি নিবেদিত ও তাঁর রচনার বিশ্বস্ততম সাক্ষী, প্রকৃত প্রস্তাবে আছি, তবু 'অমিয়' - অধিগত তিনি ছিলেন অনেকটা, অমিয় চক্রবর্তীর মনোজগতের এক দ্বারী। অমিয় চক্রবর্তীর টানেই কোয়েকার-সঙ্গ করেছিলেন কিঞ্চিৎ এবং যৌবনে অমিয় চক্রবর্তীর অনুগ্রহেই তাঁর গান্ধীদর্শন ঘটেছিল এবং সম্ভবত পাটনাতেই একবার তাঁর কাঁধ গান্ধীর হাতের স্পর্শও পেয়েছিল। থার্ড ক্লাস ট্রেনে অমিয় চক্রবর্তী কীভাবে বাঙ্কে চড়ে ধনুকের মতো বেঁকে শুয়ে শুয়ে ফেবার এ্যাণ্ড ফেবার -এর সদ্যপ্রাপ্ত কোনো বই পড়ছিলেন, তার বর্ণনা তিনি কোথাও লিখেছেন কিনা জানি না। অমিয় চক্রবর্তী - বুদ্ধদেব বসু না হয় দুই আধুনিক পূর্বসূরী, যাঁদের মানসযুগে তিনি স্বেচ্ছাকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? তিনি তো রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হেঁটে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। তেমন শহুরে হয়ে ওঠেননি তখনো মৈমনসিংহের গ্রামের ছেলে? কিন্তু গ্রাম যদি হৃদ্‌কন্দরে থেকেই যায় ক্ষতি কী, শহুরে কবিতায় তাতে হয়তো অন্য মাত্রা আসবে।

প্রাণবেন্দু দাশগুপ্তের 'অলিন্দ' পত্রিকার এক সংখ্যাতেই কি তাঁর ''বিকল্পে উটের সার'' কবিতাটি পড়েছিলাম যা এখন 'তাতারসমুদ্র - ঘেরা'-র দু-নম্বর! যদি পাঁচ-ছ-জনেরও এক কবির নামেই কবিতার নাম নয়, কবিতার নামেই কবির নাম। এর শেষ দুটো লাইনে কি অমিয় চক্রবর্তী বা অমিয় চক্রবর্তীর অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ ছায়া ফেলেছেন : 'যদিও অকল্পনীয় রাত্রিশেষে অন্য কোনো নগরের দ্বার,/ বাগানে পাখির গান, ঈশ্বরের ঘুমন্ত সংসার'? নিতান্ত ব্যক্তিমানুষের নয়, মধ্য বিশ-শতকের বিস্তর অভিজ্ঞতাই বুঝি বা এর উপজীব্য। ঠারে-ঠুরে যা বলতে পারে কবিতা তা

বলতে হয়তো বাগ্মীকে চেঁচাতে হয়। মরুভূমির চিত্রকল্পে প্রসার ঘটিয়ে তোলা এই লাইনগুলিই ধরা যাক না :

ধ্ব'সে পড়ে দিন রাত, আলো ফাটে, ছায়া দীর্ঘ হয়।
শান - দেওয়া অন্ধকারে ক্ষ'য়ে যায় নক্ষত্রবলয়।
তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে সূর্য তোলে দানবের চোখ:
ভয়ার্ত ত্রিলোক
মানে না মনসার বনে শূন্যে তোলা অভয়মুদ্রাকে।
অদৃশ্য বায়সে খায় সময়ের যে - যে ফল পাকে।

শেষ লাইনে এসে যে - সাধারণীকরণ ঘটল তা কি পুনরুচ্চার্য নয়? এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় স্বরে অনেক বেশি সুরেলা, কিন্তু ভিন্ন অনুষঙ্গ সত্ত্বেও, ভাবনায় অমনই আর্ত :

আহা রে তুই কে ফল অকালে
কৃপণ ডালে ফলতে গিয়েছিল!
কেউ এখানে ফলতে আসে না রে—
খোঁজে না কেউ বেদনা নিরিবিলি।

'দূরন্ত দুপুর' -এর সঙ্গে নরেশ গুহর নাম এতটাই জড়িয়ে আছে যে তাঁকে আমরা ওই রেকর্ডেই বারবার বাজাতে চাই। আমার এক প্রতিভাবান বন্ধু বিষয়ে তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন ওর মুশকিল ও রাতারাতি সব করে ফেলতে চায়। নরেশ গুহ আমার সেই বন্ধুর বিপরীত। কিন্তু প্রতিভার যে একটাই চেহারা আছে তা নয়। তবে নরেশ গুহ কেবল ''অলৌকিক' ('কলকাতায় বেঁচে আছি শুধু এই মহাপুণ্যবলে'), ''এক বর্ষার বৃষ্টিতে'' ('এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম'), ''শান্তিনিকেতনে ছুটি'' ('দূরে এসে ভয়ে থাক : সে হয়তো এসে বসে আছে'), ''রুমির ইচ্ছা' ('আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাঁস'), ''ট্রেন'' ('স্বর্গের করিনি আশা') প্রভৃতি লিখেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়, 'দুরন্ত দুপুর' -এর পরে খুব বেশি না হলেও আরো কবিতা ছাপিয়েছেন। ''রুমির ইচ্ছা'' -কে আট বছরের রুমিকে নিয়ে আরেকটি কবিতা আছে তাঁর : 'লাখো বছরের পুরনো জমিতে' — ছন্দসিদ্ধিতে ন্যূন হলেও ভাবনায় গাঢ়তর, তাঁর প্রতিভার সারাৎসার ভাবলে তাঁর প্রতি অবিচার হয়। তুলনামূলক সাহিত্যের যখন হাল ধরে আছেন — সন্ধ্যে সাতটার আগে কর্মস্থল ছাড়ছেন না — তখনো লিখেছেন। মনে আছে ডেভিড ম্যাকাচ্চনের মৃত্যু পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন বিয়াল্লিশ বছরের যুবক তাঁকে এতটাই কাঁপিয়ে দিয়েছিল যে ডেভিডের বন্ধু 'সবিতার জন্য' একটি কবিতা বেরিয়ে এসেছিল। (এও মনে আছে যে সবিতা ও আমার সঙ্গে তিনিও সুহৃদ ভৌমিকের গ্রাম আমদাবাদে ডেভিডের স্মৃতিসভায় গিয়েছিলেন ট্রেনে - বাসে ও হলদির খেয়া পেরিয়ে সাইকেল ভ্যানে আর শেষটা পদব্রজে)।

নিভৃতি ভালোবাসেন তিনি, কিন্তু নির্লিপ্তি নয়। তিনি বন্ধুবৎসল। অম্লান দত্ত অনশন করছেন শুনলেন তাঁর পাশে গিয়ে একবার দাঁড়াবেন, অশোক মিত্রের অসুস্থতার খবর পেলে কাতর হবেন। তাঁর 'তুমি কেমন আছো?' কথাটা অন্তঃসারশূন্য সদালাপ নয়। চারপাশের ছুটোছুটির মধ্যে তিনি নিজেকে সংবৃত রাখতে জানেন। রাজনীতির কূট তর্ক তুলে তাঁকে ধাঁধায় ফেলা খুব কঠিন নয়, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসে আঁচড় কাটা শক্ত : গান্ধী - রবীন্দ্রনাথে আর প্রাচীন প্রজ্ঞায় তাঁর শ্রদ্ধা অটল। তিনি কবি বলে কোনো বিশেষ অবধানের দাবি তাঁর নেই, দাবি যা আছে তা রুচির, কথঞ্চিৎ মানুষী সম্মানের। কিছুদিন একটা পুরোনো গাড়ি ছিল তাঁর, নিজেই চালাতেন; শুধু নিজের নয়, অন্য কারোর কারোরও তাতে চলাফেরার সুবিধে হত। নাকতলায় বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি থেকে কাউকে গড়িয়াহাট পৌঁছে দিলে তিনি যদি আড়ালে গিয়ে 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি' -র রসিকতা করতেন, তাহলে চালকের সদাশয়তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হত না, বোঝা যেত আমরা সবাই তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি। অথচ সেই গাড়ির চেহারা দেখে কারোরই মনে হত না ইনি খুব কেউকেটা লোক। পোশাকেআশাকে আলোভোলা ছিলেন না মোটেই, ছিলেন পরিচ্ছন্ন, তবে অনতিরিক্ত। আপন অপ্রতুলতা বা অভাব জ্ঞাপন তাঁর স্বভাবে ছিল না। এখনো নেই। তাঁকে আমি প্রথম দেখি পঞ্চাশের এক সুকান্তস্মরণে ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের একসময়কার বন্ধু ছিলেন তিনি : সেই সুবাদেই বলেছিলেন তাঁর যে-প্রতিকৃতি ওই সভায় শোভা পাচ্ছিল তা যেন একটু বেশি প্রতীকী, পুরোপুরি বাস্তব নয়। আমি আশা করি নরেশ গুহকে প্রতীকী বানিয়ে তুলছি না, বাস্তব করে রাখছি।